ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 896- 902
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.082

বিনতা রায় চৌধুরীর গল্পে সামাজিক সংকট ও তার উত্তরণ

অপূর্ব রায়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় (আসানসোল), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2025; Send for Revised: 24.03.2025; Revised Received: 27.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bengali Short stories are an art form that has ushered in a new era in the world of fiction. With the changing times of the world, people's thoughts, ideas, and tastes are constantly changing. It can be seen that there is a change. The mind explores something new. As a variant of this exploration, short stories appeared to the reader with a different kind of satisfaction and taste. It can be said that the nineteenth century is a fertile time for creating worthwhile short stories. Short stories of Bengali literature can also take their place in world literature with nobility. The flame of Bengali short stories that was started by Trailokyanath Mukhopadhyay, Swarnakumari Devi, and Purnachandra Chattopadhyay in the Pre-Rabindra era, was developed and flourished by the golden hand of Rabindranath. Rabindranath's contemporary and later short story writers have tried and are continuing to take that pursuit to the peak of enthusiasm.

Keyword: *Demonic, degeneration, Globalization, Helplessness, Humanity, Indians, Situation, World, Danger, Uncertainty.*

আধুনিক জীবন সমস্যা ও জীবন জিজ্ঞাসা সব থেকে বেশি প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে ছোটগল্পেই। লেখকের আত্মজগতের জীবন জিজ্ঞাসা ও অন্তর্চেতনা, সর্বোপরি চিন্তন-মনন ও মূল্যবোধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয় পাঠকের কাছে। একুশ শতকের প্রথম দুটো দশক ইতিমধ্যে কেটে গেছে, এই সময় একদিকে Globalization অপরদিকে Internet-এর মাধ্যমে Android মুঠো ফোনে গোটাবিশ্ব তালুবন্দী। এর ফলে গোটা বিশ্বের সমস্ত তথ্য হাতের তালুতে এসেছে, পাশ্চাত্যের ভেদ ঘুচেছে, দূর নিকট হয়েছে তা যেমন ঠিক, তেমনি অন্যদিকে মূল্যবোধের কাছের মানুষ, মানস সরোবরের অগম তীরের বাসিন্দা হয়েছে। হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা বিনতা রায়চৌধুরীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। পিতা মণিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আইনজীবী। বেথুন স্কুলের ছাত্রী বিনতা রায় চৌধুরী প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি. উপাধি পান। ১৯৯৭ সালে সাধনা সরকার স্মৃতি গবেষক সম্মান এবং ২০১৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান লীলা পুরস্কার। এছাড়াও তিনি হিন্দোলী সাহিত্য পুরস্কার, পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার তিনি লাভ করেন। শতপূর্ণা আশাপূর্ণা রৌপ্যস্মারক এবং বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর গল্পগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে আমাদের সমাজের সেই সমস্ত অভিব্যক্তিগুলি যা চাপা থাকে আধুনিকতার কার্পেটে। লেখিকা তাঁর গল্পে যে জীবন সত্যের মুখোমুখি পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন তা পাঠককে যেমন একদিকে

সাহিত্যরস আস্বাদিত করায়, তেমনি অপরদিকে বাস্তবের কষাঘাতে চমকিতও করে। সমাজকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য। আর মানুষ নিয়েই সমাজ। এই সামাজিক মানুষের মূল চালিকা শক্তি হলো মন। এই মানব মনের যে বহুমুখিনতা তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা। বিনতা রায়চৌধুরীর গল্প আমাদের চেনা পারিপার্শ্বিকের স্পন্দন জাগায়। মানব জীবন ও মননের যে বিবিধ স্তর, হোক তা সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয় এবং অনেকাংশে নিন্দনীয়। সবই যে এক সুনিপুণ তুলির টানে চিত্রিত হয়েছে। ফলে সভ্যমানুষের মনে দোলাচলতা চলে, যে হীনমন্যতা চলে, যে রিরাংসা বিদ্যমান যা সভ্যতার শোভনতায় সর্বদা বাইরে আসতে পারে না, সেই গোপন-সুপ্ত মানবিক ক্রিয়াগুলির প্রতিভাস যেন মূর্ত রূপ পেয়েছে এই গল্পগুলিতে। অধ্যাপিকা বিনতা রায় চৌধুরী তাঁর কলমে যেমন একদিকে শ্লীলতার রাশ টেনে ধরে রেখেছেন তেমনি সেই পরিসরে থেকেও তথাকথিত নিন্দনীয় অথচ খুব চেনা ও স্বাভাবিক জীবনকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করিয়েছেন সাহিত্যের শ্রীমণ্ডিত করে।

'প্রথমফুল' গল্পে এক গভীরতর বাস্তবের মুখোমুখি হই আমরা। চলমান জীবনের রেডিও-টিভি-নিউজ পেপার প্রতিদিনের সংবাদে যে ঘটনা আমাদের প্রতিবারই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে একজন শিক্ষিত সচেতন রুচিশীল মানুষ হিসাবে, সেই বিষবৎ ঘটনা 'ধর্ষণ' – এই গল্পের বিষয়বস্তু। সতেরো বছর বয়সী শালিনী এই বীভৎস-পৈশাচিক-নারকীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়, যখন জীবনে প্রথম কুঁড়ি আসার সময়। এই কুঁড়ি এক কিশোরী পরম যত্নে, ধৈর্য্যে, লালিত্যে ধীরে ধীরে ফুলে পরিণত করে – এই স্বাভাবিক জীবন ছন্দে পতন ঘটে ধর্ষিতা শালিনীর। শালিনীর ধর্ষণজাত যে শিশু তা সভ্যজগতের সমাজের চোখে সুকুমার মতি নয়, কুসুম পেলব নয়। স্নিগ্ধ নয় বরং তা পোকায় খাওয়া, পচা। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি শালিনীর মাতৃসত্ত্বারই বোধন ঘটেছে ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংশয়ের বেদীমূলে। সভ্যসমাজের অসভ্য কিছু দুস্কৃতী যারা, তারা অতর্কিতে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কিশোরের স্নেহ সিঞ্চিত স্বপ্ন। যে নারীত্বের চরম ও পরম বিকাশ মাতৃত্বে কিন্তু পুরুষকৃত দুষ্কর্মের ফল, নারীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করতে হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দণ্ডবিধানে। তাই সন্ন্যাসিনীর বিগ্রহের সামনে প্রভাতী পূজোর নৈবেদ্য হিসাবে তাঁর গর্ভজাত প্রথম ফুলকে রেখে আসতে হয় শালিনীকে। শালিনী জানে তাঁর গর্ভের প্রথম ফুল নিষ্পাপ। কিন্তু তার বীজ পাপীর বীজ। তাই দেবতার নৈবেদ্যই, দেবতার পাদপীঠ থেকেই তাঁর শুভ মহরতের সূচনা। একইভাবে কমল কুমার মজুমদারের "মতিলাল পাদরী" গল্পে দেখা যায়, আষাঢ় মাসের ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ-এর দুযোর্গপূর্ণ রাতে মতিলাল পাদরীর জীবন সাধন-সৌধ গির্জা ঘরে এসে পড়েছে এক সাঁওতাল রমণী। এই সাঁওতাল রমণী ভামর আসন্ন সন্তানসম্ভবা, প্রসব বেদনায় কাতর এবং নিরুপায় অবস্থায় প্রায় বিবস্ত্র হয়ে এই গির্জাঘরে স্থান নিয়েছে। প্রসব বেদনায় কাতর ভামরের গোঙানি সমস্ত প্রাকৃতিক গর্জনকে অতিক্রম করেছিল যাতে তার গোঙানি মতিলালের কর্ণগোচর হয়েছে। এর পরেই মতিলালের উদ্যোগে ফুলন এবং বীণা হাঁড়ির সহযোগিতায় সাঁওতাল রমণী ভামর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এ ঘটনা সকলের কাছে অনাস্বাদিত। এই ঘটনায় কেউ রোমাঞ্চিত, কেউ আনন্দিত, কেউ বা বিমর্ষ। সদ্যজাত শিশুর কান্নার শব্দ প্রাকৃতিক ঝড়-জল-বিদ্যুতের ঝলকানিকে দাবিয়ে রাখতে চায়, শিশুর কান্নার মধ্যে মতিলাল অন্য রকমের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে। মতিলালের ভাবান্তর ঘটে যায়। সে বুঝতে চেষ্টা করে- এই ঝড়-জলের রাতে এই দীন দুঃস্থ গির্জা ঘরে কে জন্মাল। কিন্তু মতিলাল ভাবে শিশুটির পরিচয় কি? গির্জা পার্শ্বস্থিত এলাকার মানুষ- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান নির্বিশেষে মতিলালের সম্মুখে বা পশ্চাতে সন্তানদাত্রী জননী ভামর সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য করে। মতিলাল বিরূপ সমালোচনার বিষয়ে চিন্তিত নয়। সে মনে করে, "আজ এক সোনার মানুষ জন্মাইয়াছে রে"। মতিলাল আসন্ন সংকট ও বিপদের ভাবনায় চঞ্চল হয়। সে তৃতীয় রাত্রে ভামরকে দেখেছিল। "উদম নির্লজ্জ বিবসনা" অবস্থায় মদ্যপান করে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে। এটাই এই গল্পের climax হিসেবে চিহ্নিত। কিংবা সুবোধ ঘোষের "সুন্দরম" গল্পেও সেই লাশকাটা ঘরে গর্ভবতী তুলসির মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

ইংরেজিতে প্রথম যখন গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তখন লেখক ও উপন্যাসের লক্ষ্যই ছিল নারীদের সতী নারীরূপে গড়ে তোলা। রিচার্ডসন বলেছেন, তিনি গল্পের ছলে নারীদের সতীত্ব শেখাচ্ছেন, তাঁর উপন্যাস হচ্ছে গল্পের চিনিতে ঢাকা নীতিকথা; এগুলোর ভেতর দিয়ে তিনি সতী নারী গড়তে চেয়েছেন। বাংলা ছোট গল্প ও উপন্যাসে দেখা গেছে, সেই প্রথম থেকে, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, চোখের বালি প্রভৃতিতে, খুব ভালো মানুষ, খুব সুখী পরিবার তৈরির চেষ্টা। কিন্তু ভালো মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি, সুখী পরিবার তৈরি হয়নি। মাদাম বোভারি বা

আনা কারেনিনা বা বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল এমনকি শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ ভালো মানুষের কাহিনি নয়। বঙ্কিম লিখেছেন, বিষবৃক্ষের শেষে তিনি বিষবৃক্ষ শেষ করলেন, এতে ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলবে। কিন্তু ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলেনি। দেখা যাচ্ছে পৃথিবীজুড়ে সেই ছোট গল্প, উপন্যাসগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছে যেগুলো গৃহ ভাঙার গল্প। নারীর মাংস পিণ্ড লোলুপতার সামাজিক যে অবক্ষয় বারবার দেখা যায় সাহিত্যিকরা তাকেই গল্পের বিষয়বস্তু করে গড়ে তোলেন। বিনতা রায় চৌধুরীর গল্পেও সেই সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র বারে বারে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বায়িত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেল। সম্পর্কের স্বাধীনতা, ভঙ্গুরতা, সম্পর্কের নিঃসঙ্গতা, সম্পর্কশূন্যতা এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একুশ শতকের প্রথম দুটি দশক জুড়ে নির্মিত তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ধূ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন ও তার অভিঘাত। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী সময় আর তার পরবর্তী সময়কালের মধ্যে বিস্তর রদবদল ঘটে যায়। বিশ্বায়ন আমাদের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন সাধন করল সেগুলি হল; গ্রামের মফস্সলে রূপান্তর, পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের দূরত্ব, যৌথ পরিবারের পরিবর্তে ছোট ছোট পরিবার, কেরিয়ারমুখী নতুন প্রজন্ম, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের রমরমা, প্রযুক্তির সর্বৈব ব্যবহার, ফ্ল্যাট কালচার, প্রোমোটাররাজ, বিবিধ নতুন নতুন পেশা, মানুষের নিজেকে পণ্য হিসেবে দেখনদারি, মাত্রাহীন পরিবেশ দূষণ, লৌকিক সংস্কৃতিতে শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসন, বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা গানের বিশ্বায়ন এবং সেই সঙ্গে মানুষের মনের গভীর অসুখ ডিপ্রেশন ইত্যাদি। বিনতা রায় চৌধুরী তাঁর 'আকাশ অন্ধকার' গল্পে বিশ্বায়নের সাথে মানবতা-মানবিকতার যে পারস্পরিক ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তার এক নির্জলা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভারতী ও বিদ্যাচরণ তাঁদের সুখী ও দাম্পত্য জীবন এক সুখময় আবেশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে আজীবন। সুবৃহৎ কর্মজীবন এবং রিটায়ারমেন্টের প্রাতিভেট NGO-তে যোগ দেন। তাদের ছেলে পিনাকী। প্রতিষ্ঠিত, বিদেশবাসী, প্রবাসী। বিদ্যাচরণের খেদোক্তি স্ত্রী ভারতীর কাছে— 'তোমার পিনাকী বড় হয়েছে ঠিক-ই কিন্তু, মানুষ হয়েছে কিনা কে জানে?'

সপ্তাহ-অন্তে এক-দুবার ফোনালাপেই সন্তানের কর্তব্য পালন করে। গল্পের ক্রম পরিণতিতে বিদ্যাচরণের মৃত্যুর পর পিনাকী তাঁর মাকে তাদের কাছে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায় তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বেচে দিয়ে। গল্পের পরিণতি-তে মনুষ্যত্বের নির্মম পরিণতিতে সচকিত হয়ে ওঠে পাঠক। গল্পের climax-এ দেখা যায় ভারতী ভোর-ভোর উঠে সব গোছ-গাছ করে স্বামী শোককে পিছনে ফেলে পুত্রের সাথে, তাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের নিকেতনকে পিছনে ফেলে আমেরিকার উদ্দেশ্যে গমনে তৎপর। নতুন দেশে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন জীবন শুরুর আনন্দে সে ছিলো উদ্‌গ্রীব। ছেলের সময় সংকোচনের দ্রুততায় ভারতীয় শেষ বিদায়টুকু চেয়ে আসতে পারেনি তাদের বহু পরিচিত মণি ঠাকুরপোকে। কিন্তু Airport-এ পৌঁছানটাই তার হল সার। তাঁর গুণধর ছেলে পিনাকী বসত বাড়ি ভিটেমাটি, গয়না-গাটি সমস্ত কিছু বেচে ডোমেস্টিক সেকশানে বসিয়ে রেখে ফ্লাইট ধরে দিল্লী পালিয়ে যায়। আর তখনই রোদ্রজ্জ্বল দিন হওয়া সত্ত্বেও ভারতীর 'আকাশ অন্ধকার' হয়ে যায়। লেখিকা বিনতা রায় চৌধুরী এই গল্পে দেখিয়েছেন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা কত বড় হৃদয়হীন। এই সভ্যতার বিষবৃক্ষেই মঞ্জরীত হয় পিনাকীর মতো মুকুলেরা। আসলে মানব সভ্যতার যন্ত্র চালিত আধুনিক যুগে বয়স্ক মানুষরা যেন জীবনের কাছে সংকট। যে স্বপ্ন নিয়ে পিতা-মাতা স্বস্নেহে সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলে একটু সচ্ছন্দ জীবন যাপনের আশায়, সেই স্বচ্ছন্দতার স্বাদ নিজেদের ভাগ্যে জোটে না ঠিকই কিন্তু সন্তান সেই স্বাচ্ছন্দতা পাওয়া মাত্রই বৈদেশিক কালচারে নিজের মূল্যবোধকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলে যেখানে মানবিক মূল্যবোধ, পিতৃ-মাতৃ স্নেহ পরিহাস মাত্র। অর্থ যেমন মানুষকে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ভুলিয়ে দেয়, তেমনি অসহায়তা ও একটি শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রয়ের খোঁজ মানুষকে কতটা অসহায় করে দেয় কতটা নির্বাক করে দেয় তা বিনতা রায় চৌধুরীর 'আকাশ অন্ধকার' গল্পটি পড়লে জানা যায়। আসলে যেখানে মানবিকতা, পিতৃ-মাতৃ স্নেহের কোনো মূল্য নেই, সামাজিক কর্তব্যের কোনো মূল্য নেই সেই সমাজের আকাশ তো অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকবেই।

সতীনাথ ভাদুড়ী বলেছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব হল: 'আনফিনিশড রিভিউলেশন' ও 'রিভিউলেশন বিট্রেড' এর কাল। সেই মোহভঙ্গের যন্ত্রনা, রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সবচেয়ে বেশি ভেঙ্গে তছনছ করে দিলো মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের নানা দিক। এই মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের বিভিন্ন সংকট নানান আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে। পরাধীন ভারতবাসীর মনে যে বিষ ক্রিয়াশীল ছিল তার প্রভাব আরো বেশি করে পরিলক্ষিত হতে থাকলো স্বাধীন

ভারতে নানা রাজনৈতিক উত্থান পতনের অভিঘাতে। স্বাধীনতাকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখেছিল পরাধীন ভারতবাসী, স্বাধীন ভারতে তেমন আশানুরূপ কিছুই হলো না। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের জগতে যেসব অন্যতম গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালে অশ্বমেধের ঘোড়া নামে তাঁর লেখা পাঁচটি ছোটোগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। স্বয়ম্বর সভা, প্রহরা, মৃতশহর, বসন্ত এবং অশ্বমেধের ঘোড়া এই পাঁচটি ছোটোগল্পই এতে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া জটায়ু, নরকের প্রহরী, হওয়া না হওয়া ইত্যাদি ছাটোগল্পেও বারবার মধ্যবিত্ত মননের সংকট, বাস্তবিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির মাধ্যে জীবনে এগিয়ে চলার কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। ঘোড়া গতির প্রতীক হলেও মিথ ভেঙে নামকরণের আড়ালে গল্পের অবয়বে লেখকের চিত্রায়িত মধ্যবিত্তের ক্ষত দেহের পচা-গলা অংশে অস্ত্রোপচার করেও সুখে বেঁচে থাকার চেষ্টা না অভিনয়? অসহায়তা ও আর্থিক সংকট যখন প্রকট হয় বাধ্য হয়ে অপরাধ জীবনে প্রবেশ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সেই আর্থিক সংকট ও সময়কে কেন্দ্র করে বিনতা রায়চৌধুরীর একটি গল্প হলো 'হৃদভূষণ'। 'হৃদভূষণ' গল্পে স্কুলের বন্ধু হৃদয় ও ভূষণ বহুবছর বাদে পুরোনো দুই বন্ধুর এক অ-প্রীতিকর পরিস্থিতিতে মুখোমুখি হয়। Flash back পদ্ধতিতে বর্ণিত এই গল্পে সেই সময়কার বর্ণনা করা হয়েছে যখন হৃদয় ক্লাস এইট এর মেধাবী ছাত্র। অঙ্কে তীক্ষ্ণাধী কঠিন অঙ্ক করার সময় হৃদয় ছিলো সারদের প্রিয়পাত্র। হৃদয়ের মেধার কাছে ভূষণ, ভূষি। কিন্তু জীবনের ট্রাজিক পরিণতিতে সেই মেধাবী হৃদয় আজ ছোরা হাতে ছিনতাইবাজ। ছাত্র-জীবনেই হৃদয়ের বাবা নিখিল মারা গেলে সংসারের তাগিদে তাঁর পড়াশোনা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। যে হৃদয় আশাতে বুক বেঁধেছিলো জয়েন্ট দিয়ে ডাক্তার হয়ে বিনামূল্যে গরীব মানুষের সেবা করবে, চিকিৎসা করবে। এমনই সাধু সংকল্প ছিলো তার। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের হিসেব-নিকেশ যায় পালটে। অভাবের তাড়নায় চালচুরির মধ্য দিয়ে তার অন্ধকার জগতে পথচলা শুরু হয়। আসলে সে অন্ধকার জগতের পথিক হয়েও তাঁর পিতার অবর্তমানে মা এবং বোনকেওভাবের করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলো। সে মেনে নিতে পারেনি তার মা পারুল এবং সুশোভন এর অনৈতিক সম্পর্ক। কিন্তু সে তখনই জীবন যুদ্ধে পুরোপুরি হেরে যায় যখন তাঁর মা তাঁর উপর আস্থা হারিয়ে সুশোভনরেই শরণাপন্ন হয়। এরপর সে ছোটবেলায় বাবার পরিয়ে দেওয়া 'সর্বমঙ্গলা'র মাদুলি বাজি রেখে জুয়োতে হাতে খড়ি দেয়। যে মাদুলি তার বাবা সর্ব মঙ্গলের জন্য তার গলায় বেঁধে দিয়েছিলো সেটা ছিঁড়ে ফেলে, কারণ তাঁর জীবনে অন্যরকম জীবনের সূচনা হয়। সেই অন্যরকম জীবন আসলে অন্ধকার জীবন। পরীক্ষার অঙ্কে একশোয় একশো পাওয়া হৃদয় জীবনের অঙ্কে শূন্যপায়। সমাজ ও পরিস্থিতির চাপে হয়ে ওঠে Antisocial। সমাজ পরিস্থিতির এক জাজ্বল্যমান আলেখ্য 'হৃদয়ভূষণ' গল্পটি। ছোটগল্পের আঙ্গিকে মধ্যবিত্তের বা নিম্নমধ্যবিত্তের সার্থক রূপকার হিসেবে পরিচিত সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৪)। তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে বার বার এসেছে সেই সমাজ ও তাদের জীবনের নানামুখী সংকটের কথা। যার সার্থক পরিচয় মেলে মধ্যে 'কিনু গোয়ালার গলি' গল্পটির মধ্যে। অন্য আরেকটি গল্প "দ্বিজ"। গল্পটির প্রধান চরিত্র নিশিকান্ত ছিন্নমূল যজমানী গরীব ব্রাহ্মণ। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে কলকাতায় এসে সম্মান রক্ষা করে জীবিকা নির্বাহই তার প্রধান সমস্যা। শেষ পর্যন্ত তাকে বাধ্য হতে হয় গোপনে কারখানায় কাজ করতে বা পানের দোকান খুলতে। উচ্চতর পেশা থেকে নিম্নতর পেশায় অবতরণ নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে যে আত্ম-সংকট তৈরি করেছে তা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন গল্পাকার।

সময়ের ফল্গুধারায় বহমান মনুষ্য সমাজ, ডারউইনের অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার লড়াই করতে করতে ক্রমে দ্বিধারায় এবং পরবর্তীতে ত্রিধা বিভক্ত হয়। প্রথম দুই ধারা নিম্ন ও উচ্চ বিত্ত শ্রেণি কিন্তু তৃতীয় যে শ্রেণির উদ্ভব এই সংগ্রামে ঘটেছে, সে সকল পাওয়া-না পাওয়ার মধ্যবর্তী অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অনেকটা সীমান্তের কাঁটাতারের মতো; প্রয়োজনীয় অথচ কুদর্শন। আর্থিক সংকট, অসহায়তা, বিপন্নতা, অনিশ্চয়তা এসবের টানাপোড়েনে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয় হৃদয়-এর মতো কতশত মেধাবী।

বিংশ শতাব্দীতে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য পরিবার ও স্বজনদের থেকে আলাদা আবাস বা আশ্রয়ের নাম বৃদ্ধাশ্রম। মূলত অসহায় ও গরীব বৃদ্ধদের প্রতি করুণার বোধ থেকে বৃদ্ধাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয় সেবা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ছোটবেলায় যে পিতা মাতার কাছে সন্তান সবচেয়ে বেশি আপন, যারা নিজেদের আরাম সর্বস্ব জীবন ত্যাগ করে সন্তানকে মানুষ করার জন্য নিজেদের দুঃখ কষ্ট বুকে চেপে সন্তানের হাসি-মাখা মুখ দেখার জন্য ব্যকুল থাকতেন, সন্তান না খেলে যারা খেতেন না, সন্তান না ঘুমালে যারা ঘুমাতেন না, অসুস্থ হলে যারা

ঠায় বসে থাকতেন শিয়রে, সেই বাবা-মা তিলে তিলে সন্তানের জন্য নিজেদের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন, সেই বাবা-মায়ের শেষ বয়সের ঠিকানা এখনকার বৃদ্ধাশ্রমগুলো। মানবতার প্রতি এ যেন এক চরম উপহাস। সামাজিকতার এই অবক্ষয়কে সামনে রেখে বিনতা রায় চৌধুরীর 'সায়া-শকী' গল্পটি রচিত হয়েছে। মহামায়া আর পূর্ণশশীর আজীবন বন্ধুত্বের বুনিয়াদে 'সায়া-শকী' গল্পটি। দুই বান্ধবীর কিশোরী থেকে প্রৌঢ়া-তে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে যে জীবন সেই জীবনালেখ্যই গল্পের মূল কাঠামো। দৃঢ় বন্ধুত্ব ও সুষ্ঠ প্রতিযোগীতায় সর্বোপরি পরস্পরের পতি সহানুভূতিশীলতা ও ভালোবাসায় তাঁদের বেড়ে ওঠা। রসায়নের ছাত্রী এবং দর্শনের ছাত্রী অর্থাৎ শশী ও মায়া তাদের জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নিয়েছিলো আসামের ফরেস্ট রেঞ্জার এবং রেলওয়ে অফিসারকে যথাক্রমে। বিবাহের পর যথাক্রমে কেটে গেছে সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর। মায়া নিঃসন্তান, শশীর ছেলে ইঞ্জিনিয়র। এক সময় শশী দৃঢ় বন্ধুত্বের সম্মানে অঙ্গীকার করেছিলো মায়ার কাছে— 'আমার ছেলে কি তোর ছেলে নয়?'

এই অঙ্গীকার প্রমাণের যখন সময় আসে, তখন শশী নিজেদের মধ্যে অভেদত্ব খুঁজে পেলেও তাঁর পুত্রবধূ নিপা, তার শাশুড়ির বন্ধুকে সংসারের মধ্যে সবসময় গ্রহণ করে নিতে পারেনি। গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি মায়া এবং শশীর মধ্যে যে পারস্পরিক ভালোবাসা সর্বোপরি সৌজন্যবোধ বজায় ছিলো তা এক প্রজন্ম পেরিয়ে যাওয়াতেই নীপার মধ্যে তার বিন্দু-বিসর্গ নেই। এ যেন সময়ের সাথে সমাজ যতোই অগ্রগামী হচ্ছে ততোই যেন আত্মসুখ সর্বস্ব হৃদয়হীন হয়ে পড়ছে—এ যেন তারই দৃষ্টান্ত মাতৃসমা শাশুড়িকে বৃদ্ধাবাসে পাঠিয়ে তার ঘরটাকে দখল করা পুত্রবধূ নীপার কাছে মুখ্য হয়ে উঠছে। আর এই কারণে শাশুড়ি এবং স্বামীর প্রতি যে পারস্পরিক ভালোবাসা-স্নেহ সম্পর্ক তাকেই প্রাধান্য দিতে গররাজি। শশী, তার পুত্র এবং পুত্রবধূর পরিকল্পনা জানতে পেরে তাঁর উপলব্ধি মায়ার কাছে ব্যক্ত করে বলে— 'এতদিন মনে মনে তোর কথা ভেবেছি, জীবনের খেলার আমি বুঝি এগিয়ে আছি। কিন্তু না, রে, আমি হেরে ভূত হয়েছি। কাল রাতে নিঃস্ব হয়ে গেছি আমি। যথাসর্বস্ব গেছে আমার।'

আজীবন স্নেহলালিত পুত্রও যখন তাঁকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত, তাই জানতে পেরেই পূর্ণশশীর এই খেদোক্তি। অবক্ষয়িত মানবিক সত্তা কিভাবে মাতৃ স্নেহ-মমতার কাছে স্বার্থ লোলুপ হয়ে উঠেছে তা এই গল্পটির পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। যেখানে দুটি প্রতিকূল চরিত্রের মধ্যে একজনের সন্তানহীনতা আর একজনের সন্তান থেকেও তাকে বাড়ি থেকে বের করার চক্রান্ত মিলেমিশে হৃদয় শূন্য এক মানবিক হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে।

পুরুষ শাসিত নিষ্ঠুর সমাজের লোভ-লালসায় ঘৃণ্য পৈশাচিক উল্লাসে ভারতীয় নারীর প্রেম-প্রীতিময় নীড় রচনার স্বপ্ন বারে বারে ভেঙ্গে গেছে। বারে বারে নারী তার জীবনের ব্যথা-বেদনার অভিশাপ মাথায় নিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে চরম দুর্ভাগ্যের তীরে। সেখানে সে পণ্য বিকি কিনির নিজ মানদণ্ডে হয়েছে স্বর্ণ রাগ কসের শাসন পীড়ন, অত্যাচার, নিগ্রহের নির্মম শিকার। অবশেষে মৃত্যুর কোলেই সে খুঁজে পেয়েছে তার পার্থিব গ্যথা বেদনার সমাপ্তি। ভারতের বহু কলঙ্কিত পণ প্রথার জগদ্দল পাষাণভার বুকে নিয়ে এইভাবে ভারতীয় নারী যুগ যুগ ধরে করুণ কণ্ঠে কাতর আর্তনাদ করেছে—তার করুণ আর্তনাদে পাষাণ গলেছে—কিন্তু সমাজের বুকে জাগেনি বিন্দুমাত্র বেদনা সহানুভূতি বা সমবেদনা।

পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত 'কালো রাজকন্যা' গল্পে লেখিকা বিনতা রায় চৌধুরী দেখিয়েছেন সে যুগেও যেমন তেমনি এযুগেও, সমাজের চোখে কৃষ্ণকায় মানুষেরা বিশেষত নারীরা তাদের জীবনকে নিয়ে আজও বিড়ম্বিত হয়ে পড়ে। গল্পের নায়িকা কালীশ্রী। কালো গায়ের রঙের জন্যই তার এমন নাম। অর্থাৎ তাঁর শ্রীমণ্ডিত জীবনে যেন কালিমা লিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সম্পন্ন জাতি সুবলের কাছে তার মেয়ে অত্যন্ত আদরের, রাজকন্যা তুল্য। পিতা সুবল, তার স্ত্রী সুমনাবতীর মৃত্যুর পর মাতৃহারা কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহে-যত্নে লালিত-পালিত করে। কন্যা উপযুক্ত বয়স্কা হলে বিবাহযোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে উদ্যত হয়। কালোমেয়ের জন্য সুন্দর দেখতে বরের খোঁজার অভীপ্সা এবং তা খঁজে বের করা এই দুয়ের মধ্যে যে ফারাক অন্ত্যহীন সে সেই কথা দুই দিনেই টের পায়। বহুকষ্টে কাগজ কলের শ্রমিক বিপুলকে কন্যাদানের জন্য মনস্থ করে মোটা পণের বিনিময়ে। বিয়ের পর কালীশ্রীর জীবনে তার নতুন নামকরণ হয় 'কালো বউ' নামে। যে কালীশ্রী একদিন তাঁর পিতার গৃহে রাজকন্যার মতো দিনযাপন করতো গ্রামে, দ্বিজু কাকার গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে কাপড় দিতো গন্ধে, আজ তাকে শ্বশুর বাড়ীতে গোয়াল পরিস্কার করতে

হচ্ছে খালি পেটে। শ্বশুর বাড়িতে সে খেলো কিনা না খেলো সে বিষয় নিয়ে কারো ভাববার বা মাথা ব্যথার দরকার নেই। সে সারাদিন পরিশ্রম করে একদিকে যেমন পেটের উপযুক্ত ভাত পায় না তেমনি অপরদিকে পায় না স্বামীর ভালোবাসা। তাঁর স্বামী কালীশ্রী সম্পর্কে মন্তব্য করে— 'কোথা থেকে এক কালো পেত্নি এনে মা আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।' এই তিক্তজীবন অভিজ্ঞতায় কালীশ্রী বুঝতে পেরেছে সমাজের চোখে তাঁর কদর। তাঁর পিতার দেওয়ার পণ-যৌতুকে শ্বশুর বাড়ির সমৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এই পণের গায়ে কালো রং লেগে নেই কিন্তু কালীশ্রীর গাত্রবর্ণ কালো। তাই শ্বশুর বাড়িত অচ্ছ্যুত কালো শরীর নিয়ে সে দিনভর গতর খাটাবে আর কালো বউ-এর সুন্দর বড় সুন্দর বৌদির ঘরে হিসাব মেলাবে। এই হিসেব আমাদের শুভ বুদ্ধিকে আহত করে, বিপর্যস্ত করে।

বিনতা রায় চৌধুরীর এই গল্পগুলি সার্চ-লাইট ফেলেছে সচেতন মানুষের চেতন-অবচেতন-অর্ধচেতন তিনটিই প্রকোষ্ঠে। তাই জীবনকে নিয়ে লেখা তাঁর জীবনমুখী গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে আমাদের সমাজের অত্যন্ত পরিচিত জটিল-কুটিল সমস্যাগুলি। তঁর লেখনীর প্রিজমের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের আলো প্রতিভাসিত হওয়ায় মানুষের সমাজ ও মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যে ফল্গুধারা তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে। এই গল্পগুলিতে সমাজেও বাস্তবতার যে স্পন্দন স্পন্দিত হয়েছে তা একদিকে আমাদের যেমন সচকিত করে তেমনি অপরদিকে সাহিত্য রসাস্বাদন করানোর সাথে-সাথে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসায় ভাবতে উৎসাহিত করে।

পণপ্রথা একটি সুপ্রাচীন সামাজিক ব্যাধি। যার ফলস্বরূপ প্রবহমান নারীজীবন হয়েছে বিপর্যস্ত, ব্যাহত ও সীমাহীন পশ্চাৎপদ। নারীজীবনের এ পশ্চাৎপদতার মূলে আছে জেন্ডার বৈষম্য। পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষ- নিয়ন্ত্রিত সমাজ কখনোই নারীদের পারিবারিক শৃঙ্খলের জগদ্দল থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা করেনি। বরং বারবার সামাজিক ও অপসংস্কৃতির দোহাই দিয়ে নারীদের জীবনকে করেছে দুর্বিষহ ও ক্ষতিগ্রস্ত। দুর্বিষহ এই বর্বর প্রথাকে সাহিত্যের আঙিনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'দেনা পাওনা' গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'দেনা পাওনা' গল্পেও কালো রাজকুমারীর মত নিরুপমা পণপ্রথার বলি হয়েছিল। তার পিতা রামসুন্দর ভিটেমাটি বিক্রি করেও চেয়েছিল পণের টাকা শোধ করতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শ্বশুরালয়ে অনাদরে-অবহেলায় নিরুপমার সম্ভাবনাময় জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কিছুদিন পরেই তার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য কনে পাওয়া গেল। গল্পের ভাষায়, 'এবার বিশ হাজার টাকা পণ আর হাতে হাতে আদায়'। এই প্রথা শুধুমাত্র একটি জনগোষ্ঠীর নামমাত্র প্রথা নয়, এ ছিল কন্যাগ্রস্ত পরিবারের সর্বোচ্চ হারানো সামাজিক ব্যাধি। গল্পকার বিনতা রায় চৌধুরী বারবার সেই সামাজিক সংকটের প্রতিচ্ছবিকে গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে আনতে চেয়েছেন। 'আকাশ অন্ধকার', 'কালো রাজকন্যা', 'হৃদভূষণ' বা 'মায়াশশী'র মতো অনেক গল্পই সমাজ সমস্যামূলক। যদিও গল্পকার গল্পগুলির বিষয়বস্তুতে থাকা সমস্যা থেকে যে সব আগুনের তির ছুটে আসে তার নিছক চিত্রণ করেননি লেখিকা। তিনি চেষ্টা করেছেন মানব মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটাতে। যে মূল্যবোধ একমাত্র পারে অবক্ষয়িত সমাজের চেতনা ফিরিয়ে আনতে। তিনি মনে করেন ঘৃণার উত্তরে ঘৃণা কিংবা হিংসার বদলে হিংসা উছলে উঠলে মানুষের জন্য আর কিছুই রেখে যাওয়া যায় না। তাই বিনতা রায় চৌধুরী চেষ্টা করেছেন তার লেখনীতে মানুষের চেতনে অবচেতন ঘটানো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে মানবিক মূল্যবোধ জাগরিত করতে। যার ফলস্বরূপ অশুভ শক্তির ছায়া থেকে দূর হবে সামাজিক সংকট।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, চৌধুরী বিনিতা, প্রকাশ ২০১৮, 'গল্প ২১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪।
২. তদেব: পৃষ্ঠা ৪২

আকর গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য, সুতপা, প্রকাশকাল ১লা জানুয়ারি ২০১৮, মেয়েলি আলাপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
২. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, প্রকাশকাল ২০১২, গদ্য সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৩. রায়চৌধুরী, বিনিতা, প্রকাশ ২০১৮, গল্প ২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪. বসু, অঞ্জলি, (সম্পা), জানুয়ারি ২০১৯, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৫. রায়, চৌধুরী, বিনীতা, জানুয়ারি ২০১৪, আলোর রাত আঁধার রাত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৬. পাল, বিপুল ও পাল, অরূপ (সম্পা), প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০২২, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৭. খা্ শান্তিময়, মন্ডল লিন্টু সম্পদনা,প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য, কলিকাতা লেটারপ্রেস, কলকাতা।